দৈনিক বাংলা 66
তারিখ ... 2.6 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৭৮ কলাম ৭

পঁচিশ বছরে শিক্ষার অগ্রগতি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রবাহের ধারা থেকে শিক্ষাও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রেও খানিকটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে যেমন সময় নিয়েছে, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধারিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। গত পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লক্ষ্য করলে পরিবর্তন ধারার একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাঙ্গনে একটা স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন দেশে অস্থিরতা বিরাজমান করায় শিক্ষার্থীর জীবনে সময়ের যে অপচয় ঘটে তার জন্যে প্রথমেই লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে অটো প্রমোশনের ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাজট দূর করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নিত হলেও প্রতি-যোগিতার ভাবটি থাকে না। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণমান অর্ধেকে নামিয়ে এনে পরীক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা করা হয়। তৃতীয়ত, দেশের অস্থিতিশীলতার সুযোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক নকল প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। এই নকল প্রবণতা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সবশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এমন ব্যাপক হারে দেখা দিতে থাকে যে তা প্রমাণের কোন উপায় থাকে না। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এক্ষেত্রে প্রায় নির্লিপ্ত থাকে। উনিশশো তিয়াত্তর সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছায় শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা দিলে এবং সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিয়ে অতিরিক্ত সময়ে পরীক্ষাদানের সঙ্গে পরীক্ষার হলে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতির বিরোধিতা করার ফলে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বাতিল করে পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার পর মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষার জটিলতার নিরসন হলেও নকল প্রবণতা দূর করা সম্ভব হয় না। বর্তমানেও বাংলাদেশের অধিকাংশ কলেজে এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিছুকাল আগে সরকারী কর্মচারীদের আকস্মিক পর্যবেক্ষণের পর্যায় চালু হওয়ার পর নকল প্রবণতা খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। নকল প্রবণতার ফলে শিক্ষার্থীদের মান যাচাইয়ের দিকটি বহুলাংশে বিঘ্নিত হয়েছে।

উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষার কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বিগত পঁচিশ বছরে দেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দ্বিধারিক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষাজট দূর করার লক্ষ্যে কোর্স পদ্ধতির প্রচলন হয়। পূর্ববর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে একশ নম্বর নির্ধারিত ছিল। কোর্স পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি পূর্ণপত্রকে ভেঙে দুটো ইউনিটে পঞ্চাশ নম্বর করে বিভাজন করা হয়। এই পঞ্চাশ নম্বরের মধ্যে চল্লিশ নম্বর নির্ধারিত থাকে লিখিত পরীক্ষার জন্যে এবং দশ নম্বর অনুশীলনীর জন্যে। আগে একশ নম্বরের মধ্যে পঞ্চাশ নম্বর ছিল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ অনার্স শ্রেণী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব এমএ শ্রেণীর জন্যে। অবশিষ্ট পঞ্চাশ নম্বর ছিল মৌখিক পরীক্ষার জন্যে। কোর্স পদ্ধতিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্যে একশ নম্বর নির্ধারণ করা হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষার একশ নম্বর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে বন্টিত হয়ে থাকে। কোর্স পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেকটি কোর্স ও কোর্সের অনুশীলনী পরীক্ষা একজন শিক্ষক গ্রহণ করবেন। পূর্ববর্তী সময়ে একটি পূর্ণপত্র বিভিন্ন শিক্ষক পাঠদান করতেন এবং অনুশীলনী পরীক্ষাও বিভিন্ন শিক্ষক নিয়ে থাকতেন। কোর্স প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলবিন্যাস প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে স্বতন্ত্রভাবে করা হয়ে তিন বছরের ফলাফল একত্রে যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হত। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর সমান চাপ পড়তে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিবর্তন আনা হয় সমন্বিত কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে। কোর্স পদ্ধতির সঙ্গে অনুষঙ্গী বিষয় অঙ্গীভূত করে ফলাফল বিন্যাস এই প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। নতুন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল অনুষঙ্গী বিষয়ে বিভাগেই পাঠদান করা হবে এবং অনার্স বিষয় লক্ষ্য করে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অনুষঙ্গী বিষয়ের সিলেবাস প্রবর্তন। নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের পর তিন বছর অতিক্রান্ত না হলে সমন্বিত কোর্স পদ্ধতির গুণাগুণ সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে উনিশশো চুয়াত্তর সালে প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করে। অর্ডিনান্স অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তিন বছর নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, ডীনের পদ নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আগে ডীন পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না এবং সিনিওরিটি অনুযায়ী ডীনের মনোনয়ন দেয়া হত। বিভাগের চেয়ারম্যান ও চাকরির স্থায়িত্বকাল অনুযায়ী একই পদে আসীন থাকতেন। এছাড়া, সিনেটের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে তিনজন উপাচার্য পদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্বাচন করা হয় এবং নির্বাচিত তিনজন শিক্ষকের মধ্য থেকে সরকার একজনকে মনোনয়নদান করে থাকেন।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে শেষের বিশ্ববিদ্যালয় দুটি টেকনিকাল পর্যায়ের। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে ঢাকার গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা হলেও পরে ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, আইন এবং আরও কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণ বিষয় ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করায় শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করতে হয়। গ্রামীণ শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে ইংরেজী সিলেবাস আগের তুলনায় অনেক সহজ করা হলেও সাধারণ, মেধাবী ও শহরস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্যে ইংরেজী অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি আগে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ইতিহাস, ভূগোল স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পঠিত হলেও বর্তমানে সমাজ ও বিজ্ঞান এই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞান পাঠে শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞানদান ছাড়াও প্রতিটি অধ্যায়ে প্র্যাকটিকাল দিক অন্তর্ভুক্ত। পূর্বের পাটিগনিত বর্তমানে বহুলাংশে পরিবর্তিত এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নতুন অঙ্কের অন্তর্ভুক্তি বিশেষ লক্ষণীয়। এছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক শ্রেণীর প্রশ্ন অন্তর্ভুক্তির জন্যে পাঠ্যসূচীতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে একটা সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এসেছে।

বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে বর্তমানে টেকনিকাল ও প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ, চাকরির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা। সাম্প্রতিককালে দুটি বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। এ দুটো বিষয় হল ব্যবসায় প্রশাসন ও কমপিউটার সায়েন্স। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স ফ্যাকালটিতে বিবিএ অন্তর্ভুক্ত হলেও আইবিএ ইন্সটিটিউটে বিবিএ ও এমবিএ পাঠদান প্রবর্তিত হয়েছে। আইবিএতে প্রথম আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এমবিএ কোর্স প্রচলন করা হয় এবং পরবর্তীতে বিবিএতে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। আইবিএর প্রোগ্রাম উন্নত হলে শিক্ষার্থীদের কাছে এর চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারের ব্যবহারের জন্যে এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তার ফলে, প্রথম দিকে প্রাইভেট ফার্মের উদ্যোগে কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিভাগ থাকলেও এখানে আসনসংখ্যা সীমিত। পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কম্পিউটার বিভাগ খুলে শিক্ষার পথ বিস্তৃত করা হয়েছে।

শিক্ষার নবতর ধারা বাংলাদেশকেও স্পর্শ করেছে। গত কয়েক বছরে উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করার লক্ষে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রচলিত পদ্ধতি ক্লাস অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। তার পরিবর্তে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেদের বিষয়ের জন্যে কিছু হ্যান্ডআউট তৈরি করেন যেগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত করে দিয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সাম্প্রতিককালে কিছু সংখ্যক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কতকগুলো বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীদের উচ্চ বেতনের জন্যে সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে থাকে। এই কারণে এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণের মধ্যে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাছাড়া, এখানে শিক্ষার্থীদের মানও সন্তোষজনক নয়। বর্তমানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিছুসংখ্যক শিক্ষকদের মধ্যেও প্রেরণা বিস্তার করেছে। এর ফলে দু এক বছরের মধ্যে ললিতকলা বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সমস্ত কলেজ নিয়ন্ত্রণ করলেও সাম্প্রতিককালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কলেজ নিয়ন্ত্রণের ভার পড়েছে তাদের ওপর। এর ফলে বিভিন্ন কলেজের অনার্স ও এমএ পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কলেজের নিয়ন্ত্রণভার চলে যাওয়ার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর শিক্ষার্থীর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কলেজে অনার্স ও এমএ বিষয় খোলার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা কতখানি বাস্তব চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। কারণ, এদেশের অসংখ্য কলেজে, বিশেষ করে ছোট ছোট শহরে অবস্থিত কলেজে শিক্ষকদের সংখ্যা সীমিত, ক্লাসকক্ষের অভাব, পাঠ্যগ্রন্থের অপ্রতুলতা ও শিক্ষাদানে যোগ্যতার অভাবের জন্যে শিক্ষার্থীরা কতখানি লাভবান হবে তা বলা কঠিন। তাছাড়া, উচ্চশিক্ষা দ্বারে দ্বারে খুলে দেওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান। একদিকে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষার্থী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একটা উদাহরণ দিলেই একথা বোঝা যাবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় আশি ভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি পেলেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান মাত্র কুড়ি ভাগ। এক্ষেত্রে, মফস্বল ও বড় বড় শহরের কলেজ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

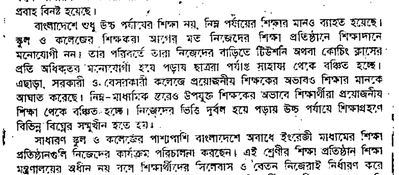

সম্প্রতি ঢাকার জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করা হলেও পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেতে সময়ের প্রয়োজন। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স পাস, দ্বিতীয়ত, কলেজের কাঠামো পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে কলেজকে প্রতিষ্ঠিত করা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ না কমলেও নতুন শিক্ষার্থীদের সামনে সুযোগ আসবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের।

বাংলাদেশের শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক না হলেও হতাশাব্যঞ্জক বলে চিহ্নিত করা যাবে না। সম্পূর্ণ আশাব্যঞ্জক না বলার কারণ দুটি। প্রথম, শিক্ষক সমাজ, দ্বিতীয়ত ছাত্র সমাজ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণ প্রবণতা বৃদ্ধি ও প্রাধান্য পাওয়ায় শিক্ষকদের স্ট্যান্ডার্ডের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এই প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও ভাল ডিগ্রির অধিকারী ছাড়া অন্যদের নিয়োগদান করা হত না। সেখানে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত, এমনকি অনেকক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও নিজেদের দল ভারী করার জন্যে নিয়োগদান করা হয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে। দলীয়করণ মানসিকতা এতই প্রাধান্য পেয়েছিল যে অখ্যাত, অজ্ঞাত প্রাইভেট কলেজ থেকেও শিক্ষক এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমোশন নীতি চালু করার পর শিক্ষকরা অবাধে উচ্চতর পদে প্রমোশন পেয়ে থাকেন। বর্তমানে কোন পদ খালি আছে কিনা তা বিবেচ্য নয়। শূন্য পদ না থাকলেও শিক্ষকদের প্রমোশনে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। আগে যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিসাব করা হত প্রফেসর, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও লেকচারার হিসাবে, এখন এই পরিসংখ্যান বিপরীত হয়ে গেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, তারপর ক্রমানুয়ে হিসাব করা যায় সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের। এছাড়াও, প্রমোশন নীতিমালার জন্যে অনেক মেধাবী উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষককে সাধারণ শিক্ষকের সমপর্যায়ে এনে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও, পে-স্কেলের পরিবর্তনে সিনিয়রিটি ও জুনিয়রিটির ব্যবধান হ্রাস পাওয়ায় সিনিয়র শিক্ষকরা নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। এছাড়াও শিক্ষকরা শিক্ষকতার চেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা প্রজেক্টে কাজ করার প্রবৃত্তি দেখানোর ফলে শিক্ষকতার মান হ্রাস পেয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির ব্যাপক চর্চার ফলে শিক্ষার পরিবেশ নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্বে শিক্ষাঙ্গন নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অনবরত বন্ধ, অথবা হরতাল বা ধর্মঘট শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে। এর ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক ছাত্রদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ায় শিক্ষার সচল প্রবাহ বিনষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশে শুধু উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা নয়, নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষার মানও ব্যাহত হয়েছে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা আগের মত নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানে মনোযোগী নন। তার পরিবর্তে তারা নিজেদের বাড়িতে টিউশনি অথবা কোচিং ক্লাসের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়ায় ছাত্ররা পর্যাপ্ত সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া, সরকারী ও বেসরকারী কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবও শিক্ষার মানকে আঘাত করেছে। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিজেদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণে বিভিন্ন বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

সাধারণ স্কুল ও কলেজের পাশাপাশি বাংলাদেশে অবাধে ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন নয় বলে শিক্ষার্থীদের সিলেবাস ও বেতন নিজেরাই নির্ধারণ করে থাকেন। বিদেশী পাঠ্যবই ব্যবহারের ফলে এখানকার শিক্ষার্থীরা দেশীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে কোন জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয় না। এছাড়াও, এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি শ্রেণী পার্থক্য গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। দেশীয় সংস্কৃতি জীবনধারার পরিচর্যা ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও সাজাত্যবোধ জাগান সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাজটের কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে বিদেশে গিয়ে অধ্যয়নের যে প্রবণতা সৃষ্টি করেছে তা বন্ধ করা প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার জন্যে পৃথিবীর যে কোন দেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। কিন্তু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অনবরত বিদেশ গমন দেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় হিসাবে গণ্য করা উচিত। এর জন্যে প্রয়োজন দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাজট দূর করা এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা।

একজন প্রকৃত শিক্ষার্থী তৈরির ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক, পরিবেশ ও পর্যাপ্ত সুযোগের প্রয়োজন। এই দিকগুলি যাতে একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সহজপ্রাপ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারী নীতিমালা প্রয়োজন। জীবনের চাহিদা ও বৈশ্বিক প্রয়োজনের দিক চিন্তা করে শিক্ষার নীতিমালা প্রণীত না হলে বাংলাদেশ ক্রমশ অন্যান্য দেশের তুলনায় পেছনে পড়ে রইবে।